



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 398 - 406

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যভাষায় পরাবাস্তববাদের অনুরণন

মিঠুন রায়

গবেষক, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : Mithunroy492@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Surrealism,
psychic
Automatism,
dream and sub
conscious mind,
dangers of
external and
internal world,
surrealistic
language of Mohit
Chatterjee.

Abstract

Surrealism emerged as a rebellious art movement in the early 20th century in response to the protests, disappointments, and spiritual crises that spread in European art and literature after the First World War. Surrealism highlighted the overall danger of the external and internal worlds in a kind of surrealistic expression. It emerged with the revolutionary consciousness of radical changes in art, society and politics. Surrealism became a wonderful expression of the subconscious mind, dreams, and imagination through a kind of 'Psychic Automatism'. On the other hand, Mohit Chatterjee emerged in Bengali literature with a completely exceptional poetic dramatic language. He brought an existential, surrealistic, deep political consciousness to the Bengali stage. This article attempts to establish the internal relationship and connection between Mohit Chatterjee's exceptional dramatic language and surrealism. This article uses various examples to show that the relationship between Mohit Chatterjee's plays and surrealism is not just a visual or superficial resemblance, but rather a fundamental and existential connection between Mohit Chatterjee's dramatic world and the deeper concept of surrealism. Like surrealism, Mohit Chatterjee's plays become a creative protest against the cruel reality of the external world and the inner turmoil.

Discussion

“আমার ধারণা, বাস্তবকে ধরতে পারে না বাস্তবধর্মীনাটক সেভাবে, যেভাবে পারে বাস্তবতার থেকে দূরে সরে আসা, বিমূর্ততার দিকে সরে আসা যে নাটক। - সে পারে বাস্তবতাকে বেশি করে ধরতে।”

- মোহিত চট্টোপাধ্যায়।

ষাটের দশকে যখন মূলধারার বাংলা নাট্যজগৎ তখনও বাস্তবধর্মীতার ঘেরাটোপে বন্দী, তখন মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদলের সূচনা করে। তিনি আবির্ভূত হন এক প্রতীকধর্মী নাট্যভাষা নিয়ে,

যা বাংলা নাটকের পরিসরকেই শুধুমাত্র সম্প্রসারিত করেনি বরং তা চেতনাগত স্তরেও এক নতুন আলোড়ন তোলে। বাংলা নাটকে যখন রূঢ় বাস্তববাদী ধারায় পুনরাবৃত্তির ক্লাস্তি ও ভাষার সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তখন মোহিত চট্টোপাধ্যায় সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী নাট্যভাষা নিয়ে আবির্ভূত হন। তাঁর নাটক শুধু শৈলীতে নয় অস্তিত্ববাদী দর্শনের অভিব্যক্তিতেও অনন্য হয়ে উঠেছিল। তিনি নাট্যরূপকে মুক্ত করেন প্রথাগত সংলাপ, কালচক্র ও চরিত্র নির্মাণের শৃঙ্খল থেকে। তাঁর নাট্যভাষা প্রত্যক্ষ বাস্তবের ছব্ব অনুকরণ নয়— সেখানে প্রতীক আছে, বিভ্রম আছে এবং সর্বোপরি আছে অস্তিত্বের গূঢ় সংকেত। কবিতার মতো বিমূর্ত ভাষাভঙ্গিতে মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাট্যচিন্তার পরিসরকেই আমূল বদলে দেন— বাংলা নাট্যমঞ্চে এনে দেন এক অস্তিত্ববাদী, পরাবাস্তবধর্মী গভীর রাজনৈতিক চেতনার স্ফূরণ, যা আজও অনিবার্য ও অনতিক্রম্য।

আমরা আমাদের এই আলোচনায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের এই ব্যতিক্রমী নাট্যভাষার সঙ্গে পরাবাস্তববাদের একটি আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক ও সংযোগ নির্মাণে প্রয়াসী হব। এই উদ্দেশ্যের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমাদের প্রথমই বুঝে নেওয়া দরকার কেন আমরা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের সঙ্গে পরাবাস্তবতাকে সংযুক্ত করার চেষ্টা করছি, এটি কি কেবলই বহিরাঙ্গিক সাদৃশ্যের জন্য নাকি পরাবাস্তববাদের সামগ্রিক ধারণার সঙ্গেই তাঁর নাটকের গভীর সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব? আমরা এই বিশ্বাস থেকেই এই আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি যে, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের সঙ্গে পরাবাস্তবতার সম্পর্ক কেবল চিত্ররূপের বা দৃশ্যের বহিরাঙ্গী সাদৃশ্য নয়— বরং পরাবাস্তবতার গভীরতর ধারণার সঙ্গে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকীয় জগতের একটি মৌলিক ও সত্তাগত সংযোগ আছে।

এখন মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের সঙ্গে পরাবাস্তবতার সংযোগটি অনুধাবন করতে হলে আমাদের প্রথমই স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন— পরাবাস্তববাদ আসলে কী, কীভাবে তার ভাবনার বিস্তার ও কীভাবে তা নিজেকে প্রকাশ করে। পরাবাস্তববাদ কেবল একটি শৈল্পিক কৌশল নয়, বরং এটি দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক চেতনার এমন এক বহিঃপ্রকাশ, যার শিকড় গভীরভাবে নিহিত আছে মানুষের অবচেতন, স্বপ্ন ও যৌক্তিক বাস্তবতার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার সর্বাত্মক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপীয় শিল্প ও সাহিত্যে যে বিক্ষোভ, হতাশা ও অস্তিত্বগত সংকট ছড়িয়ে পড়েছিল, তারই প্রতিক্রিয়ায় বিশ শতকের শুরুর দিকে এক বিদ্রোহী শিল্প আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে পরাবাস্তববাদ। যদিও এর শিকড় খুঁজে পাওয়া যায় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে গড়ে ওঠা ডাডাবাদী আন্দোলনের অযৌক্তিকতা ও প্রথাবিরোধী শিল্পচেতনার মধ্যে তবুও পরাবাস্তববাদ তার নিজস্ব দর্শন ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির কারণে এক স্বতন্ত্র পথ রচনা করতে সক্ষম হয়েছে।

পরাবাস্তববাদী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল মূলত ফরাসি কবি আন্দ্রে ব্রঁতের নেতৃত্বে, ১৯২৪ সালে প্রকাশিত ‘Manifesto of Surrealism’ বা পরাবাস্তববাদী ইশতেহারের মাধ্যমে। এছাড়া ১৯৩০ সালে প্রকাশিত ‘Second Manifesto of Surrealism’ বা পরাবাস্তববাদের দ্বিতীয় ইশতেহার, ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত ‘Political Position of Surrealism’, ১৯৪২ সালে প্রকাশিত ‘Prolegomena to a Third Surrealist Manifesto or Not’ এর মাধ্যমে আমরা পরাবাস্তববাদের ধারণা, এর মূল উদ্দেশ্য ও এর রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে পারি। প্রথমে পরাবাস্তববাদের সামগ্রিক ধারণাটিকে সূত্রাকারে তুলে ধরার চেষ্টা করি—

এক. যখন একদল শিল্পী ও সাহিত্যিক দেখতে পেলেন চারিপাশের বাস্তবতায় যুদ্ধ, আগ্রাসন, শাসনব্যবস্থার ভয়াবহ রূপ, প্রযুক্তির অমানবিক ব্যবহার এবং সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা— তখন তাঁদের চেতনায় জন্ম নিল জীবনের প্রতি তীব্র সন্দেহ ও অবিশ্বাস। ব্রঁত পরাবাস্তববাদের ইশতেহারটি শুরুই করেন এইভাবে—

“So strong is the belief in life, in what is most fragile in life—real life.”^২

মূলত জীবন ও অস্তিত্ব সম্পর্কিত এই বিপত্তা থেকেই পরাবাস্তববাদের উদ্ভব। পরাবাস্তববাদী শিল্পীমহল একদিকে যেমন বহির্জগতের নির্মম, অযৌক্তিক এবং অপ্রত্যাশিত বাস্তবতাকে তুলে ধরেন, তেমনি মনোজগতের নানা ভয়, দুঃস্মৃতি,

আতঙ্ক ও বাসনার বিকৃত প্রতিচ্ছবি উঠে আসে তাঁদের রচনায়। উদাহরণস্বরূপ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে আঁকা সালভাদোর দালির একটি বিখ্যাত পরাবাস্তবধর্মী চিত্রের দিকে তাকানো যেতে পারে—



‘The Burning Giraff’ (1937) By Salvador Dali

চিত্রটির পটভূমিতে আমরা দেখতে পাই একটি জ্বলন্ত জিরাফকে যা আমাদের মনে একধরনের আতঙ্ক সৃষ্টি করে, যেন মনে হয় এটি কোন এক দুঃস্বপ্নের দৃশ্যকল্প। এই জিরাফটি হতে পারে ডারউইন-এর অভিব্যক্তিবাদের একটি প্রতীক। মানুষ একসময় ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসকে উপেক্ষা করে আশ্রয় নিয়েছিল বিজ্ঞান ও যুক্তির কাছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির অমানবিক ব্যবহারে মানব অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় অঙ্কিত এই চিত্রটি আমাদের এই ইঙ্গিত দেয়, বিজ্ঞান অমানুষের সেই কাক্ষিত আশ্রয়ভূমি হয়ে উঠতে পারেনি, বরং সমগ্র পৃথিবীকেই এনে দাঁড় করিয়েছে এক বিরাট ধ্বংসযজ্ঞের সামনে। চিত্রটিতে দেখতে পাওয়া অসংখ্য তীরবিদ্ধ মানব অবয়ব দুটি অস্বাভাবিকভাবে বিকৃত। তাদের শরীরে ড্রয়ারের মতো খোলা ছোট-ছোট বাক্স যেন অবচেতন মনের গোপন কুঠুরি, যা থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে মানব অস্তিত্বের সংকট ও আতঙ্ক। এভাবেই পরাবাস্তবতা হয়ে ওঠে এক বিপন্ন পৃথিবীর অসহায় আর্তনাদ। একইভাবে সালভাদোর দালির ‘Face of War’ (১৯৪০), আর্দ্রে মাসৌর ‘Battle of fishes’ (১৯২৬) পাবলো পিকাসোর ‘Guernica’ (১৯৩৭) চিত্রগুলির কথাও বলা যেতে পারে, যে চিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে একধরনের বিপন্নতা ফুটে ওঠে পরাবাস্তব ভঙ্গিমা।

দুই. পরাবাস্তববাদ নিছক একটি শিল্পধারা নয় বরং এটি এক বিদ্রোহী চেতনার নির্ভুল প্রতিফলন। এই বিদ্রোহ কখনো যুক্তিবাদী শৃঙ্খলার প্রতি, কখনো নীতিশাস্ত্রের আরোপিত আদর্শের প্রতি, আবার কখনো সামাজিক-রাজনৈতিক নির্মাণ—যেমন; ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ বা পুঁজিবাদের শোষণচক্রের প্রতি। পরাবাস্তববাদ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত বোধ ও কাঠামোর বিরুদ্ধে এক অন্তর্জাগতিক অস্বস্তিসহ প্রতিবাদী স্বর হয়ে ওঠে। একদিকে যেমন ফ্রেয়েডীয় মনস্তত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়ে পরাবাস্তববাদ মানুষের অবচেতন মনের অপার রহস্য ভেদ করতে চেয়েছে তেমনি অন্য দিকে মার্কসবাদী বিদ্রোহী চেতনাকেও একই সঙ্গে ধারণ করতে প্রয়াসী হয় পরাবাস্তববাদী শিল্পীগণ। স্রেষ্ঠ স্পষ্টতই বলেন—

“Our allegiance to the principle of historical materialism.... there is no way to play on these words. So long as that depends solely on us—I mean provided that communism does not look upon us merely as so many strange animals intended to be exhibited strolling about and gaping suspiciously in its ranks—we shall prove ourselves fully capable of doing our duty as revolutionaries.”^৩

অর্থাৎ পরাবাস্তববাদ আসলে বহুমুখী বিদ্রোহী চেতনা নিয়ে আবির্ভূত হয়।

তিন. পরাবাস্তববাদী শিল্পীমহল মনে করেন বাস্তবতা শুধু বাইরের বস্তুজগতে সীমাবদ্ধ নয় মানবমনের অভ্যন্তরীণ বিশ্বায়ক জগতও বাস্তবতার অংশ এবং তা গভীরতর সত্য। ফ্রেয়েডের মনোবিশ্লেষণ তত্ত্বের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত পরাবাস্তববাদী শিল্পীগণ তাই স্বপ্ন, হ্যালুসিনেশন, হঠাৎ আসা ভাবনা কিম্বা ‘Stream of consciousness’ কে বিশেষ

গুরুত্ব দিয়েছিল। পরাবাস্তববাদ একধরনের মানসিক স্বয়ংচেতনার কথা বলে যা কোনো যুক্তিবাদী নিয়ন্ত্রণ, নৈতিকতা বা নান্দনিক পরিমাপের উপর নির্ভর করে না। ব্রঁঁত স্পষ্টতই বলেন—

“SURREALISM, n. Psychic automatism in its pure state, by which one proposes to express—verbally, by means of the written word, or in any other manner—the actual functioning of thought. Dictated by thought, in the absence of any control exercised by reason, exempt from any aesthetic or moral concern.”⁸

চার. পরাবাস্তববাদী শিল্পীগণ একধরনের ‘অচেনা বাস্তবতা’ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যা দর্শক বা পাঠকের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করবে, ফলে দর্শক বা পাঠক তার নিজস্ব মনস্তত্ত্ব ও অবচেতন জগতের মুখোমুখি হবেন। পরাবাস্তববাদী শিল্পীদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ‘বিস্ময় সৃষ্টি’, ব্রঁঁতর দৃষ্টিতে বিস্ময় শুধুমাত্র একটি কাব্যিক বা নান্দনিক মূহূর্ত নয়, বরং তা মানুষের অভ্যন্তরীণ মানসিক জগতের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনকারী এক রূপান্তরকারী শক্তি। কয়েকটি পরাবাস্তবধর্মী চিত্রকর্মের দিকে তাকালেই আমরা এর মধ্যে অচেনা বাস্তবের বিস্ময়কর উপস্থিতি খুব সহজেই অনুভব করতে পারব।



‘The Great Masturbator’ (1929) by Salvador Dali



‘The Persistence of Memory’ (1931) by Salvador Dali



‘Ubu Emperor’ (1923) by Max Ernst



‘Not to Be Reproduced’ (1937) by Rene Magritte

সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরাবাস্তববাদের ‘বিস্ময়’ সম্পর্কে মন্তব্য করেন—

“ব্রৈতো জোর দিয়েছিলেন জীবনের বিস্ময়ের উপরে। এই বিস্ময় আছে ভয়ে, আছে স্বপ্নে, অবদমনে, নিদ্রায়, ভালোবাসায়, আকস্মিকে; আছে দিবাস্বপ্নে, ভান-করা বিশৃঙ্খলায়, অলস ভ্রমণে, কবিতায়, অতিপ্রাকৃতে, অস্বাভাবিকে, অভিজ্ঞানে। প্রথম সুররিয়ালিস্ট ইশতাহারে ব্রৈতো ঘোষণা করেছিলেন : বিস্ময় সর্বক্ষণ সুন্দর। যা-কিছু বিস্ময়কর তাই সুন্দর, আর শুধুমাত্র বিস্ময়ই সুন্দর।”^৫

পাঁচ. পরাবাস্তবতা শুধু শিল্প বা সাহিত্যকে পরিবর্তন করার জন্য নয় বরং এটি মানুষের চেতনা, সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি এবং বাস্তবতা অনুধাবনের রীতিকে আমূল বদলে দেওয়ার এক অনিবার্য হাতিয়ার হয়ে ওঠে। ফ্রান্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই আন্দোলনটি একটি বৈপ্লবিক আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

এখন পূর্ববর্তী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পরাবাস্তববাদের মূল ভাবনাবীজটিকে এই সূত্রে উপস্থাপন করতে পারি—

ক. পরাবাস্তববাদ বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের সামগ্রিক বিপন্নতাকে তুলে ধরে একধরনের অধিবাস্তব প্রকাশভঙ্গিতে।

খ. পরাবাস্তববাদ শিল্প, সমাজ ও রাজনীতির আমূল পরিবর্তনের বৈপ্লবিক চেতনা নিয়ে আবির্ভূত হয়।

গ. একধরনের মানসিক স্বয়ংক্রিয়তার মাধ্যমে অবচেতন মন, স্বপ্ন ও কল্পনার বিস্ময়কর প্রকাশ হয়ে ওঠে পরাবাস্তববাদ।

এখন পরাবাস্তববাদের এই মূল ভাবনাবীজকে অবলম্বন করে আমরা মোহিত চট্রোপাধ্যায়ের নাট্যভূবনে প্রবেশ করতে পারি। মোহিত চট্রোপাধ্যায়ের নাট্যভাষা ও রূপবন্ধের মধ্যে পরাবাস্তববাদী চেতনার যে প্রবাহ লক্ষ্য করা যায় তা ক্রমান্বয়ে আলোচনায় অগ্রসর হতে প্রয়াসী হই—

প্রথমত, যেভাবে রিয়ালিজমের ধ্যান ও ধারণা থেকে পৃথক হয়ে উঠেছিল পরাবাস্তবতা, ঠিক সেভাবেই মোহিত চট্রোপাধ্যায় তাঁর নাট্যজগতকে ‘রিয়ালিস্টিক কনভেনশন’ বা বাস্তবানুগ ধারার গণ্ডি থেকে বের করে নিয়ে আসেন এবং প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়েন নন রিয়েলিস্টিক নাটকের দিকে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন—

“মানুষের যে কোনও fixed identity নেই, বা মানুষ যে কোনও fixed time and space-এর মধ্যে মানসিকভাবে সীমাবদ্ধ থাকে না তা একটা truth এবং তা real। মজার কথা, realism যতটা না এই real-এর কাছাকাছি তার চেয়ে non-realism ঢের বেশি কাছাকাছি। তাই paradoxically বলা যায়, non-realism is more realistic than realism।”^৬

মোহিত চট্রোপাধ্যায় বুঝেছিলেন, সমাজের জটিল বাস্তবতা, মানুষের অস্তিত্বসংকট, অবচেতন মন ও ভয়ের অদৃশ্য অভিঘাতকে কেবলমাত্র বাস্তবধর্মী নাট্যরীতির মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়না। তাই তিনি নাটকে এমন এক ভাষা, কাঠামো ও দৃশ্যতত্ত্ব নির্মাণ করলেন যা বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত, অথচ বাস্তবতাকেই নতুনভাবে চিত্রিত করতে সক্ষম। মোহিত চট্রোপাধ্যায়ের এই ধারণা পরাবাস্তবতার ধারণার সঙ্গে প্রবলভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, পরাবাস্তবতা সংক্রান্ত পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি কীভাবে পরাবাস্তববাদ বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের নানাবিধ বিপন্নতাকে এক জটিল শিল্পভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। যুদ্ধ, স্বৈরশাসন, মানুষের আত্মবিচ্ছিন্নতা ও অস্তিত্বসংকট— এই সবকিছুর সম্মিলিত অভিঘাতে জন্ম নেয় পরাবাস্তববাদ। মোহিত চট্রোপাধ্যায়ের নাটকের দিকে তাকালে পরাবাস্তবধর্মী একধরনের বিপন্নতা অত্যন্ত স্পষ্ট ও শক্তিশালীভাবে প্রতিভাত হয়। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যেতে পারে—

এক. -

“লোকটি।। সব কিছুতে লোভ। আমি স্পষ্ট করে পেতে চাই, দু’হাতের মধ্যে দেখতে চাই। চোখের কাছে খাদ্যের স্তূপ চাই, নাহলে রাগে ঘুম হয়না, মনে হয় রক্তে ছারপোকা ঢুকেছে, চিন্তার মধ্যে বিরক্তিকর মাছি উড়ছে, জ্বালাচ্ছে। কেবল চাঁদের আলো নয়, মাংসের বলের মতো চাঁদটা আকাশ থেকে ছিঁড়ে চার হাত-পায়ের মধ্যে ভীষণভাবে ধরে দাঁত নখে ছিঁড়ে খেতে চাই। আমার দুই কষ দিয়ে

জ্যোৎস্নার রস গড়িয়ে পড়বে। আপনার ভাবতে ভালো লাগছে না, একটা কুকুর বলের মত চাঁদটা নিয়ে খেলছে, তারপর চুপচাপ কামড়ে খেয়ে নিচ্ছে।”^৭ - (কণ্ঠনালীতে সূর্য)

দুই. -

“প্রৌঢ়।। ...আসলে একটা মারমুখী গুগলি বল নানা কায়দায় তীব্র বেঁকে কিংবা ধূর্ত মোচড়ে বারবার আমাদের দিকে ছুটে আসছে, তাই না? আর এ-ভাবেই কি আমাদের লেগস্টাম্প বা অফস্টাম্প কিংবা মিডলস্টাম্প, ভেঙে যায়নি? আমরা অনুক্ষণই একটা মারমুখী বলের দিকে তাকিয়ে আছি, হাতে একটা অসহায় ব্যাট! দিস ইজ রিয়্যাল ক্রিকেট।”^৮ - (নীলরঙের ঘোড়া)

তিন. -

“লোকটি।। বলা সম্ভব নয়। ভাবলে আমার সমস্ত অস্তিত্ব কাঁটা দিয়ে ওঠে! মনে হয় একটা ক্ষিপ্ত ভয়ংকর কাল বেড়াল রক্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে কামড়ে যাচ্ছে! রাত্তির হলে অন্ধকারটা হাতুড়ির মতো বুকে ঘা দিতে থাকে।”^৯ - (মৃত্যুসংবাদ)

একইভাবে আরও বহু উদাহরণ মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের অলিতে গলিতে খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে বহির্জগতের ও মনোজগতের এক অদ্ভুত বিপন্নতা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বিপন্নতা থেকে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে মানুষের অস্তিত্বসংকট, বিচ্ছিন্নতাবোধ, জীবনের অর্থহীনতার বোধ। ব্রঁঁত এই পৃথিবীকে বলেছিলেন ‘a world at best inhabitable’ অর্থাৎ বসবাসের অযোগ্য একটি পৃথিবী। মোহিত যেন আশ্চর্য এক পরাবাস্তব ভাষায় পৃথিবীর এই রূপকেই স্পষ্ট করে তুলতে চাইলেন তাঁর নাটকের মধ্যে।

তৃতীয়ত, যেভাবে পরাবাস্তবতা বহুমুখী বিদ্রোহী চেতনার প্রকাশরূপে ধরা দেয়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকেও সেই বৈপ্লবিক চেতনার প্রকাশ খুব স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যায়। পরাবাস্তববাদ একটি বহুমাত্রিক বিদ্রোহের ভাষা রচনা করেছিল — প্রথাগত বাস্তবতার গায়ে আঘাত করে, প্রচলিত নীতিশাস্ত্র ও যুক্তির কাঠামোতে ফাটল ধরিয়ে এবং শিল্পভাবনার দীর্ঘদিনের অনুশাসন ভেঙে দিয়ে। একইভাবে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সৃজনভূমিতে বাস্তবতা কখনোই স্থির বা একরৈখিক নয়— ‘কণ্ঠনালীতে সূর্য’ (১৯৬৩), ‘নীলরঙের ঘোড়া’ (১৯৬৪), ‘মৃত্যুসংবাদ’ (১৯৬৫), ‘গন্ধরাজের হাততালি’ (১৯৬৬), ‘রাজরক্ত’ (১৯৭১) ইত্যাদি বহু নাটককে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে বাস্তবতা এখানে বিভ্রান্তিকর, ধোঁয়াটে ও ভাঙা আয়নার মত। সেই ভাঙন থেকেই উঠে আসে এক নতুন রূপের সন্ধান, যা শুধুই দৃশ্যমান বাস্তবতার অনুকরণ নয়।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে পুঁজিবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী বিদ্রোহী চেতনা ভীষণভাবে স্পষ্ট। ‘কণ্ঠনালীতে সূর্য’ নাটকে লোকটি চরিত্রের নানান কথোপকথনের মাধ্যমে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইঙ্গিতপূর্ণভাবে উঠে আসে। চরিত্রটি বলে—

“লোকটি।। (চাপা অথচ তীব্র স্বরে) দে আর চেজিং মি। এ লোনলি টেরিবল্ হাংরি ডগ ইজ বার্কিং ইন মি। কুকুরটা ভিতরে বড্ড জোরে ডাকছে। আমি থাকব কেমন করে? ওরা আমাকে খুঁজছে, সাঁড়াশি হাতে করে এগুচ্ছে। আমি কেমন করে পালাব, বাঁচব কেমন করে?”^{১০}

নাটকে, ‘হাংরি ডগ’, ‘কুকুরধরা গাড়ি’, ‘খ্যাপাকুকুর’ ইত্যাদি অনুসঙ্গ আমাদের তৎকালীন সময়ের ‘হাংরি আন্দোলন’ ও ‘নকশাল আন্দোলন’ের প্রেক্ষাপটটিকে মনে করায়।

‘সিংহাসনের ক্ষয়রোগ’ নাটকটিতেও ‘জীবনলাল’ ও ‘চিত্রকর’ চরিত্র দুটির মাধ্যমে মোহিত চট্টোপাধ্যায় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের বার্তা দেন।

“জীবনলাল।। রাজা মেঘের আঁচ লেগেছে। মিথ্যে একটা যন্ত্র বানিয়ে ওরা কেমন সবাইকে জুজুর ভয় দেখাবে ভেবেছে। কাগজে দেখছো না, কত ভয়ের ছবি, ভয়ের গন্ধ। দেশের মানুষ আজকাল সব টের পায়, ভাঙা বুকটা নিঃশ্বাসে ফুলিয়ে রুখে দাঁড়ায়। আমার বুকের মধ্যে আর একটা জীবনলাল ঢোলক বাজায় আর বলে— পুরবাসীগণ, সিঁদুরে মেঘ উঠেছে, — বরণডালা সাজাও।”^{১১}

‘রাজরক্ত’ নাটককেও নাটককারের রাজনৈতিক ভাষা ও স্মেরাচারী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

“দ্বিতীয়।। জনতার দাবি, রাজাসাহেবের রক্ত চাই।

প্রথম।। রাজাসাহেব আজও জীবিত।

ছেলেটি।। না, রক্ত! রক্ত! ছুরিটা থেকে এখনও ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে! রাজাসাহেবের রক্ত! যেন সিঁদুরে মেঘটা গলে গলে পড়ছে। দরজাটা বন্ধ করে দাও। রাজাসাহেবের রক্ষী আসবে। দরজাটা বন্ধ করে দাও। আ-আ-! আমাকে ধরে নিয়ে যাবে!”^{২২}

পরাসাম্ভবাদী ইন্তেহারে আমরা ব্রৈতকে বলতে শুনেছিলাম—

“The simplest surrealist act consists of dashing down into the street, pistol in hand, and firing blindly.”^{২৩}

ব্রৈতর এই বৈপ্লবিক সুরই যেন ‘রাজরক্ত’ নাটকে তীব্রভাবে প্রতিধ্বনিত হতে দেখা যায় পরাসাম্ভবধর্মী প্রকাশভঙ্গিতে। মার্ক্সবাদকে যেমন পরাসাম্ভবাদ এক বৈপ্লবিক চেতনারূপে গ্রহণ করেছিল, মোহিত চট্টোপাধ্যায় সরাসরি মার্ক্সবাদের সঙ্গে যুক্ত না হলেও ভেতর থেকে তিনিও একই আদর্শ আঁকড়ে ধরেছিলেন। নাট্যকার মনোজ মিত্রের একটি উদ্ধৃতির দিকে এর জন্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—

“হ্যাঁ, মোহিতবাবুরও ওই রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি অনুগত্যটা ছিল এবং বেশ কটরভাবেই ছিল। মনে হয় জীবনের শেষ দিন পর্যন্তই ছিল। দু-একটা স্মৃতি আমার বেশ মনে আছে। তখন আমরা দু’জনেই কলেজে পড়াছি। কলেজ-টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ওয়েবকুটা) কোনো-কোনো সিদ্ধান্ত বা কাজকর্ম আমার বা ওঁর পছন্দ হত না। কিন্তু মোহিতবাবুর সাথে সেই সূত্রে কথা বলে দেখেছি ওই বামপন্থী রাজনীতি ও তার মতাদর্শের প্রতি ওঁর অনুগত্যটা বেশ প্রবল ছিল। এবং এইসব ব্যাপারে মোহিতবাবুর অবস্থান বেশ কটর।”^{২৪}

সুতরাং, যে বিদ্রোহ নিয়ে এসেছিল বিশ শতকের প্রথমার্ধে পরাসাম্ভবাদ তাকে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে মোহিত চট্টোপাধ্যায় যথার্থভাবেই অনুসরণ করেছেন, তাঁর নাটকের অভ্যন্তরে পরাসাম্ভবধর্মী বিদ্রোহের অনুরণন তীব্রভাবে ফুটে ওঠে।

চতুর্থত, পরাসাম্ভববাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল একধরনের ‘Psychic automatism’ বা মানসিক স্বয়ংক্রিয়তার মাধ্যমে মানুষের অন্তর্জগতের, বিশেষ করে অবচেতনে বা স্বপ্নালোকের অভ্যন্তরে চলতে থাকা অনুভব, চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরা। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের বিশেষ কিছু চরিত্রের সংলাপ যেন হয়ে ওঠে একপ্রকার অন্তর্জগতের বিস্ফোরণ। চরিত্রগুলি যেন এক অদ্ভুত ঘোরলাগা ছন্দে অনবরত কথা বলে চলে। বাস্তবতা ও কল্পনার সীমারেখা মুছে গিয়ে নাটকের দৃশ্যপটে একপ্রকার অধিবাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং তারই ভেতর থেকে উঠে আসে অস্তিত্বের সংকট, একাকিত্ব ও মগ্নচেতনের মৌন আতর্নাদ। ‘কণ্ঠনালীতে সূর্য’ নাটকে এক অদ্ভুত মানসিক অস্থিরতায় ‘লোকটি’ চরিত্রটি অনর্গল বলতে থাকে—

“লোকটি।। ধরুন, ধরুন; অনর্গল পিং-পং বল পড়ছে মুখ থেকে, অনেক অনেক। সমস্ত ঘরে ড্রপ খাচ্ছে, সবাই ড্রপ খাচ্ছে—আপনি, আমি, টেবিল, চেয়ার। জানলা দিয়ে তাকান, রাস্তা, ল্যাম্পপোস্ট, লোকজন, গোটা পৃথিবী ড্রপ খাচ্ছে। সমস্ত শরীরটা বড়ো খারাপ লাগছে, অদ্ভুত দুর্বল লাগছে। (খাটে হাতের ভরে আধশোয়া হল) আমি আমার ছোটবেলা দেখতে পাচ্ছি। ছোটবেলার পুকুরধারের চাঁদটা ড্রপ খেতে খেতে ঘরে ঢুকছে। (মিলুকে) সরুন আপনি, মনে হচ্ছে চাঁদটা বেশ শক্ত। ঠিক আপনার কপালে লাগবে। আমার পিছনে আসুন, পিছনে আসুন। চাঁদটাকে কে আঁচড়ে দিয়েছে। কে যেন কয়লা ভাঙতে ভাঙতে ধরেছে, চাঁদটায় কালি লেগে আছে। আপনি সরুন; ফুঁ দিন, জানালা দিয়ে সরে যাক। ফুঁ দিন।”^{২৫}

আবার, ‘গন্ধরাজের হাততালি’ নাটকেও এমন বহু উদাহরণ পাওয়া যায়, যা পরাসাম্ভব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ভীষণভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ—

“হরি।। দেখুন, আমি চশমাটা পালটেছি। এবারের কাচটা নীলচে। আপনাকে আমি একটা নীলের মধ্যে দেখছি। জানেন, নীল আর সবুজ বড় অহঙ্কারী রঙ। যখন রাত্তির হয় বাগানে ঢুকে দেখবেন। অন্ধকার ধীরে ধীরে সব রঙগুলোকে চিবিয়ে নিশ্চিহ্ন করতে থাকে। নীল, সবুজ গাছপালার পাতা তবু অন্ধকারে জ্বলতে থাকে। ওদের পুরোপুরি গ্রাস করা যায় না। আপনার চোখে মুখে দেখছি এই নীল। আপনার এমনি নীল রঙের মত বাঁচতে ইচ্ছে করে না?”^{১৬}

পঞ্চমত, পরাবাস্তবতার অন্যতম মুখ্য উপাদান হলো ‘বিস্ময়’ যা যুক্তির পরিসরকে অতিক্রম করে বাস্তবতার পরিচিত কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে দর্শক বা পাঠকের মনে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। শ্রেষ্ঠ পরাবাস্তবাদের ইশতেহারে স্পষ্টতই বলেন—

“the marvelous is always beautiful, anything marvelous is beautiful, in fact only the marvelous is beautiful.”^{১৭}

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যভাষায় আমরা এই বিস্ময়েরই এক অনন্য রূপ খুঁজে পাই। তাঁর নাটকের এক একটি অংশ যেন হয়ে ওঠে কোনো এক দুঃস্বপ্নের দৃশ্যকল্প। ‘কণ্ঠনালীতে সূর্য’ নাটকে দেখা যায় একজন মানুষ মনে করছেন তার কণ্ঠে সূর্য আটকে গেছে। এই অলীক ভাবনাকে কেন্দ্র করে নাটকে তৈরি হয়েছে, আশ্চর্য কিছু মূর্ত্ত। উদাহরণস্বরূপ নাটকের একটি অংশ তুলে ধরা হল —

“ডাক্তার।। অসম্ভব। একজাতীয় পাখি খোঁজ করছি আমি, অস্ট্রেলিয়ার পিউট্রাস গাছের ডালে দেখা যায়। পাখিটার শরীরের প্রায় সবটাই ঠোঁট, ছোট্ট একটুখানি মাত্র শরীর। আপনার ঠোঁটে বসে গলার মধ্যে চঞ্চু ঢুকিয়ে সূর্যটা ও টেনে তুলতে পারবে। তবে তার আগে গলার ভিতরের সূর্যটায় একটা আংটা লাগিয়ে নিতে হবে। নয়তো গোল সূর্য ঠোঁটে ধরায় অসুবিধা।

লোকটি।। ঠিক ধরেছেন আপনি। কিন্তু সূর্যটায় আংটা লাগাবেন কেমন করে?

ডাক্তার।। তাও ভেবে রেখেছি। ভালোবাসা, দুঃখ কিম্বা প্রাণখোলা হাসি থেকে যদি চোখে জেনুইন জল আসে তা দিয়ে কেমিক্যাল প্রক্রিয়ায় একরকম আঠা তৈরি করা যায়। সেই আঠা দিয়ে একটা আংটা সাঁড়াশি দিয়ে কণ্ঠনালীর সূর্যে আটকে দিতে হবে।”^{১৮}

একইভাবে আশ্চর্য বিস্ময়কর দৃশ্যভাবনা আমরা ‘সোনার চাবি’ নাটকেও বহুসংখ্যায় দেখতে পাই। ‘গৌতম’ চরিত্রটি পরাবাস্তবধর্মী কাব্যের মতোই নিরন্তর বলতে থাকেন —

“গৌতম।। (স্বপ্নমুগ্ধের মত) অপূর্ব আপনার চোখ—ঘন পল্লব, গভীর দৃষ্টি, অপলক, রহস্যময়। যেন সমুদ্রের তলার শ্বেত শঙ্খটি আপনি দেখতে পান, যেন মাটির নিচের বীজ, বুকের তলদেশের জলে ভেসে বেড়ানো সোনালি রূপোলি মাছ, আপনার চোখে পড়ে। আমি অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি, অনেক কিছু—মেঘের মত দৃশ্যের পর দৃশ্য ভেসে যাচ্ছে—একটা অদ্ভুত গাছ, প্রত্যেকটা পাতার রং আলাদা; একটা নদী, প্রত্যেকটা ঢেউ—এর রঙ আলাদা; নন্দিতা ... নন্দিতা—ওর শরীরে জ্যোৎস্না পড়ছে, চোখ হাওয়ায় বুজে আসছে...একটা সবুজ পাতা নড়ে ওঠার শব্দ দূর থেকে বীণার মত বেজে উঠল! কী অদ্ভুত সব দৃশ্য, শব্দ... দৃশ্য, শব্দ...”^{১৯}

অর্থাৎ যে বিস্ময়কে পরাবাস্তববাদ তার অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করে, মানুষের অভ্যন্তরীণ মানসিক দোলাচলতাকে দৃশ্যরূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছে— মোহিত চট্টোপাধ্যায় সেই বিস্ময়কে শুধু ধারণই করেননি, বরং নাট্যরূপে তাকে আত্মস্থ করেছেন এক গভীর শৈল্পিক অভিব্যক্তিতে।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকসমূহ আমাদের এক স্বতন্ত্র নাট্যভাষার মুখোমুখি দাঁড় করায়, যেখানে পরাবাস্তববাদী চেতনা ও শৈলীকৌশল আমাদের কাছে স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয়। পরাবাস্তববাদের মতোই তাঁর নাটক হয়ে ওঠে বহির্জগতের নিষ্ঠুর বাস্তবতা ও অন্তর্জগতিক অস্থিরতার প্রতি এক সৃজনশীল প্রতিবাদ। তাঁর নাটকে ব্যবহৃত প্রতীক, অসংলগ্নতা, ভাবগম্বীর নৈঃশব্দ কিম্বা বিস্ময়কর সংলাপ এ সবই আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মঞ্চ কেবল

বিনোদনের স্থান নয়, তা হতে পারে চেতনাজাগানিয়া এক স্বপ্নলোক-যেখানে শিল্পী তাঁর স্বপ্ন, বিভ্রম, প্রতিবাদ ও বেদনার ভাষায় নির্মাণ করেন এক বিকল্প বাস্তবতা। এভাবেই মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যভাষায় পরাবাস্তবতা হয়ে ওঠে অস্তিত্বের গভীরে পৌঁছানোর এক অনন্য অভিব্যক্তি।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, মোহিত, থিয়েটার ও বাস্তবতা, মোহিত চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, কলকাতা ৭০০০১৪, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ২৭
২. Breton, Andre, Manifesto of Surrealism (1924), Translated from the French by Richard Seaven and Helen R. Lane, The University of Michigan Press, 1972, P. 3
৩. Breton, Andre, Second Manifesto of Surrealism (1930), Translated from the French by Richard Seaver and Helen R. Lane, The University of Michigan Press, 1972, P. 142
৪. তদেব (২ নং), P. 26
৫. সৈয়দ, আবদুল মান্নান, বিংশ শতাব্দীর শিল্প আন্দোলন, পাঠক সমাবেশ, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৫১
৬. চট্টোপাধ্যায়, মোহিত, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে বাস্তবতা, মোহিত চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, কলকাতা ৭০০০১৪, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ১২
৭. চট্টোপাধ্যায়, মোহিত, কণ্ঠনালীতে সূর্য, নাটকসমগ্র, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ৭০০০৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, জুলাই ২০১৯, পৃ. ২৬
৮. চট্টোপাধ্যায়, মোহিত, নীলরঙের ঘোড়া, নাটকসমগ্র, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ৭০০০৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, জুলাই ২০১৯, পৃ. - ৩৮
৯. চট্টোপাধ্যায়, মোহিত, মৃত্যুসংবাদ, নাটকসমগ্র, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ৭০০০৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, জুলাই ২০১৯, পৃ. ৯৪
১০. তদেব (৭ নং), পৃ. ২২
১১. চট্টোপাধ্যায়, মোহিত, সিংহাসনের ক্ষয়রোগ, নাটকসমগ্র মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ৭০০০৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, জুলাই ২০১৯, পৃ. ২৫৫
১২. চট্টোপাধ্যায় মোহিত, রাজরক্ত, নাটকসমগ্র, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ৭০০০৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, জুলাই ২০১৯, পৃ. ৪২০
১৩. তদেব (৩ নং) P. 125
১৪. মিত্র, মনোজ, ভারতবর্ষের থিয়েটারেই নাটককার হিসেবে মোহিতবাবু অনন্য, মোহিত চট্টোপাধ্যায় স্মরণসংখ্যা, রঙ্গপট নাট্যপত্র ২০১২, পৃ. ৩১৯
১৫. তদেব (৭ নং), পৃ. ১২
১৬. চট্টোপাধ্যায়, মোহিত, গন্ধরাজের হাততালি, নাটকসমগ্র, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ৭০০০৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, জুলাই ২০১৯, পৃ. ১৩৬
১৭. তদেব (২ নং), P. 14
১৮. তদেব (৭ নং), পৃ. ১৫
১৯. চট্টোপাধ্যায়, মোহিত, সোনার চাবি, নাটকসমগ্র, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ৭০০০৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, জুলাই ২০১৯, পৃ. ৫২৯